ATHENA, VOLUME IX, JULY 2025 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 224–234
www.athenajournalcbm.in

সাহেবধনী সম্প্রদায়: প্রসঙ্গ ধর্ম-দর্শন ও সাধনপদ্ধতি

রাকিবুল হাসান বিশ্বাস*

প্রাপ্ত: ২৭.০২.২০২৫ পরিমার্জন: ১৭.০৫.২০২৫ গৃহীত: ০৫.০৬.২০২৫

সারসংক্ষেপ: *সাহেবধনী সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গ তথা নদিয়া জেলার প্রধান গৌণধর্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম। নদিয়ার কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত শালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের বনাঞ্চলে একজন উদাসীন বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল সাহেবধনী। উদাসীনের নাম সাহেবধনী বলে পরবর্তীতে এই সম্প্রদায়ের নাম হয় সাহেবধনী। উদাসীনের প্রধান শিষ্য মুলিরাম পালের হাত ধরেই সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মতাদর্শ বিস্তার লাভ করে। মুলিরাম পালের মধ্যমপুত্র শ্রীচরণ পাল এই সম্প্রদায়কে আরও সুসংগঠিত ও প্রসারিত করেন এবং তাঁদের সাধনার আসন দোগাছিয়া গ্রামের পূর্বদিকে জলঙ্গীর অপর পাড়ে বৃত্তিহুদা গ্রামে স্থানান্তরিত করেন। সাহেবধনীরা মূলত বৈষ্ণব-সহজিয়া মার্গ প্রভাবিত। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের গানে বার বার এসেছে রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ, এসেছে গোরাচাঁদের কথা, এসেছে বৃন্দাবনও। সাহেবধনীদের প্রচার ও প্রসারের মূল আধার হলো তাঁদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বলিত গান। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন লোকগীতিকার হলেন, কুবির গোঁসাই, যাদুবিন্দু গোঁসাই, রামলাল ঘোষ প্রমুখ। কুবির গোঁসাই ছিলেন প্রধান গান রচয়িতা ও গায়ক। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনকালে প্রায় সাড়ে বারোশো গান রচনা করেছেন। এই গানের মাধ্যমেই সম্প্রদায় প্রসারিত হয়েছে— প্রচারিত হয়েছে সম্প্রদায়ের নিজস্ব তত্ত্ব ও দর্শন। সাহেবধনীদের সাধনতত্ত্বের অন্যতম বিষয় হলো দেহতত্ত্ব। এঁরা সাধনসঙ্গিনীর সাহায্যে মিথুনাত্মক সাধনার দ্বারা কামকে জয় করে মোক্ষলাভ করতে চান। এই দেহসাধনা একেক সম্প্রদায়ে একেকরকম হলেও মূল লক্ষ্য প্রায় একই এবং এই দেহসাধনার মধ্যে দিয়েই সম্প্রদায়গুলোর দার্শনিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।*

সূচক শব্দ: *গৌণধর্ম, সাহেবধনী, সহজিয়া, সুফিবাদ, দোগাছিয়া, দেহতত্ত্ব, কর্তাভজা, অগ্রদ্বীপ।*

*SACT-1, বাংলা বিভাগ, হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজ, উত্তর চব্বিশ পরগনা।
e-mail: rakibulhasanbiswas@gmail.com

১

সাহেবধনী সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গ তথা নদিয়া জেলার প্রধান গৌণধর্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম। সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলায় যে-সব ধর্ম উদ্ভূত হয়েছে বা তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তা বাংলার গৌণধর্ম সম্প্রদায়গুলির ভিত্তিভূমি। কেননা, মুখ্য ধর্মগুলির উদ্ভব কিংবা অনুপ্রবেশের পর কালক্রমে প্রায় প্রতিটি ধর্মই একে অপরকে প্রভাবিত করেছে এবং তার প্রভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন গৌণধর্ম এবং তার সম্প্রদায়। সহজিয়া মতের উৎপত্তির মূলে বৌদ্ধ ধর্ম। পরবর্তীকালে এই সহজিয়া ধর্মের প্রভাবে হিন্দু ধর্মের যে শাখাটি উদ্ভূত হলো, তা হলো বৈষ্ণব সম্প্রদায়। অতঃপর এল ইসলাম ধর্ম এবং তার হাত ধরে এল সুফিবাদ। তারও প্রভাব পড়ল তৎকালীন বাংলার ধর্ম ও দর্শনে। সেও সহজিয়া, শাক্ত প্রভৃতি প্রচলিত ধর্মমতের প্রভাবে তার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি করল নব নব মতবাদ, নব নব সম্প্রদায়।

বাংলায় গৌণধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "বাংলার শাক্ত ধর্মও এই সহজিয়া মতের সহিত মিলিত হইয়া গেল। ফলে একদিকে নূতন নূতন শাক্ত সম্প্রদায় ও অপরদিকে নাথপন্থী, সহজিয়া, অবধূত, বাউল প্রভৃতি সৃষ্টি হইল।"[১] অধ্যাপক গোলাম মুরশিদও প্রায় একই কথা বলেছেন— "ধীরে ধীরে শাক্ত, তন্ত্র এবং সহজযান মিলে সহজিয়া ধর্ম সৃষ্টি হয়েছিলো। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এর অন্য যেসব শাখা দেখা দেয়, সেগুলি হলো নাথপন্থী, অবধূত, বাউল ইত্যাদি।"[২] তাই সহজ ভাষায় বলা যায়, সহজিয়াগণের ধর্ম ছিল কতকগুলি গুহ্যসাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীতে এই সহজিয়া ভাবের প্রভাব এসে পড়েছিল বৈষ্ণব ধর্মে এবং এইভাবেই গড়ে ওঠে বৈষ্ণব-সহজিয়া মত। পরবর্তী নানা সময়ে তার সাথে যুক্ত হয়েছে তন্ত্র, মিথুন, যোগাচার ও সুফিবাদ। এই ভাবেই বাংলায় বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছে নানান গৌণধর্ম সম্প্রদায়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে গৌণধর্ম হিসেবে বাউল সম্প্রদায়ের উৎস সন্ধান নিমিত্তে একখানি রেখাচিত্র নির্মাণ করেছেন[৩]:

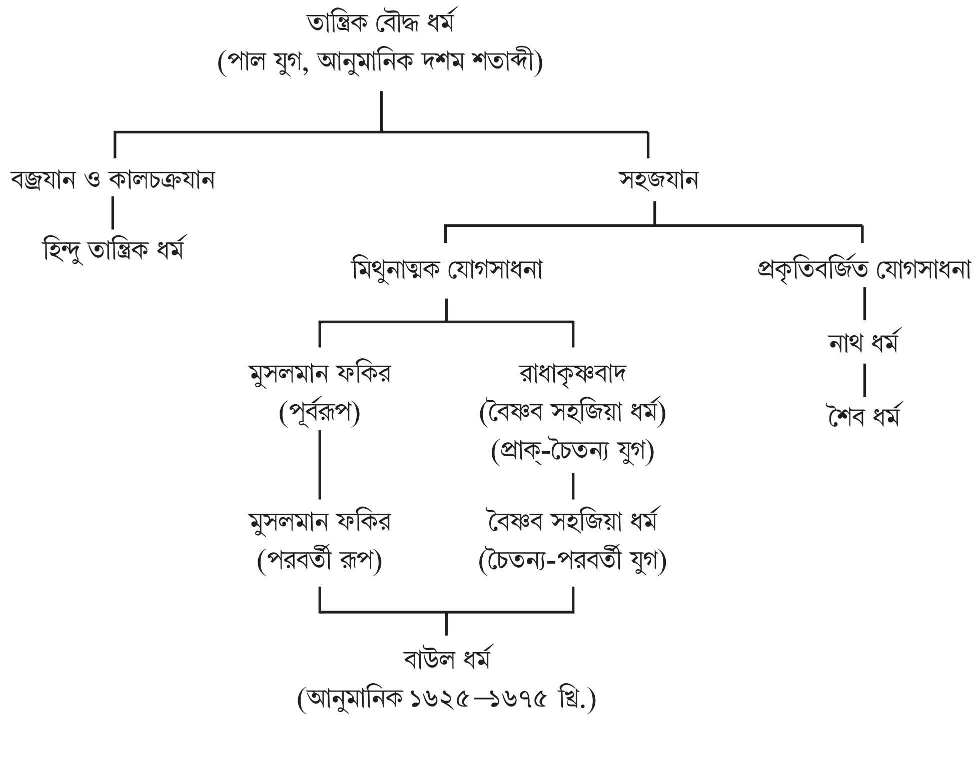

অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (প্রথম ভাগ) গ্রন্থে বাংলার বহু উপধর্ম বা গৌণধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো— রামানন্দী, কবীরপন্থী, খাকী, মলুকদাসী, দাদুপন্থী, রৈদাসী, সেনপন্থী, রামসেনহী, মধ্বাচারী, বল্লভাচারী, মীরাবাঈ, কর্ত্তাভজা, রামবল্লভী, সাহেবধনী, বাউল, ন্যাড়া-নেড়ি, দরবেশ, সাঁই, আউল, সাধ্বিনী, সহজী, খুশিবিশ্বাসী, গৌরবাদী, বলরাম হজরতী, গোরারাই, পাগলনাথী, তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী, অতিবড়ী, রাধাবল্লভী, সখীভাবক, চরণদাসী, কুড়াপন্থী, বৈরাগী, নাগা প্রভৃতি। ননীগোপাল গোস্বামী তাঁর 'চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব' গ্রন্থে গৌণধর্মের একটি তালিকা পেশ করেছেন অনেকটা কবিতার আদলে:

"কিশোরীভজা ভজন খাজা কত বলি হায়।
গুরুভোগী গুরুত্যাগী আরও যে বাহিরায়॥
অসীমাত্যজা প্রণতিমজা আর বাসুদেবী খল।
দারী-সন্ন্যাসী শিষ্যা-বিলাসী গুরু-প্রসাদী দল॥
উপনয়নত্যজা পরমহংসসাজা সঙ্করবর্ণ যত।
অসৎসঙ্গ দ্বিপাদভঙ্গ সেবাপরাধী তত॥
রামদাস হরিদাস হরিবোলিয়া মত।
নিতাই-রাধা গৌর-শ্যাম বর্ণিব বা কত॥
সীতারামিয়া রাধাশ্যামিয়া শাউড়ির দল আর।
ঘরপাগলা গৃহী বাউলা সব চিনে উঠা ভার॥
বর্ণবিরাগী আশ্রমরোধী গৈরিকবিরোধী ষণ্ড।
ধামাপরাধী নামাপরাধী বৈষ্ণবাপরাধী ভণ্ড॥
অদ্বয়বাদী মধ্ববিরোধী এসব পাষণ্ড।
কানুপ্রিয়া নাথ-ভায়া অকাল কুষ্মাণ্ড॥
গৌড়েশ্বর বংশীধর উলাইচণ্ডীবাদ।
স্মরণপন্থী-অধোমন্থী যুগলভজন সাধ॥
দাদা ও মামা ক্ষেপা বামা আর যত অপসম্প্রদায়।
দেশে বিদেশে সাধুর বেশে ঘুরছে ফিরছে হায়॥"[৪]

—এ থেকে বোঝা যায় এই বাংলার গৌণধর্মগুলির বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা। তবে এতগুলি গৌণধর্ম সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা হয়তো কোনো গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। এইসব মতের অধিকাংশই ছিল গোপনীয়। বিশেষ সাধকবৃন্দ ব্যতীত সাধারণ শিষ্যদের সে-সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করার মতো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল না। তাছাড়া এই সকল সম্প্রদায়গুলি বিশেষ অঞ্চল জুড়েই বিস্তৃত ছিল। তার বাইরে ততটা প্রসার লাভ করতে পারেনি। ফলত এইসব ধর্ম সম্প্রদায়ের অধিকাংশই আজ অস্তিত্বহীন। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, চৈতন্য-পরবর্তী সময় থেকে অষ্টাদশ শতকের পূর্বাবধি এই সম্প্রদায়গুলির অস্তিত্ব বজায় ছিল।

২

সাহেবধনীদের সম্পর্কে প্রথম লিখিত উল্লেখ পাওয়া যায় অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। গ্রন্থটিতে অক্ষয়কুমার মহাশয় জানান যে, নদিয়ার কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত শালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের বনাঞ্চলে একজন উদাসীন বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল সাহেবধনী। হিন্দু মতাবলম্বী কয়েকজন ও একজন মুসলমান তাঁর শিষ্য ছিলেন। উদাসীনের নাম সাহেবধনী বলে পরবর্তীতে এই সম্প্রদায়ের নাম হয় সাহেবধনী।

শালিগ্রামের নিকটস্থ গ্রাম কালীনগরের বাসিন্দা, পেশার শিক্ষক ফজলুর রহমান বিশ্বাসের দেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, শালিগ্রামের পশ্চিম দিকের মাঠ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। একজন মুসলমান সাধক লোকচক্ষুর অন্তরালে এই জঙ্গলময় জায়গায় আস্তানা গড়ে তোলেন। সাধকের নাম ছিল সাহেবপির। এলাকার লোকের কাছে তিনি কাটাপির নামেও পরিচিত ছিলেন। শোনা যায়, এই সাহেবপিরকে কখনও কখনও বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে ভ্রমণ করতেও দেখা যেত। তাঁর এরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল বলে লোকে বিশ্বাস করত।[৫]

ফজলুর রহমান সাহেবের দেওয়া সাক্ষাৎকার অনুযায়ী সাহেবপির যে মুসলমান ছিলেন, সে-কথা অসঙ্গত নয়; কেননা দীনেশচন্দ্র সেন থেকে আহমদ শরীফ পর্যন্ত অনেক পণ্ডিতের অনুমান এই যে, সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মূলে ছিলেন একজন মুসলমান। সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন, "অবশ্য সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে সাহেবধনীদের উদ্ভবের সূচনায় মুসলমান সূত্র আর অনুমানের বিষয় নয়, সত্য।"[৬]

সাহেবপিরের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দোগাছিয়া নিবাসী মুলিরাম পাল। সাহেবধনী সম্প্রদায়ভুক্ত, কুবির গোঁসাইয়ের শিষ্য কবি রামলাল ঘোষ তাঁর একটি গানে গুরুবংশের ইতিহাসের আদ্যোপান্ত বিবরণ পেশ করেছেন। এই বিবরণ থেকে সাহেবধনীদের উদ্ভব-বিকাশের ইতিহাসের পাশাপাশি গুরুদের বংশপরিচয় সম্পর্কেও বিশদে জানা যায়। পদটি এরকম:

"শ্রীগুরু চরণে ধরি প্রথমে বন্দনা করি দয়াল দিনবন্ধু গুণনিধি।
অপার ভবার্ণবে শ্রীপদ্দতরণি দিবে এই আশা করি নিরবধি॥
প্রভু নিজগুণে হয়ে বদ্ধ করিলেন কৃপাসিদ্ধ মুলিরাম পাল মহাশয়ে।
বন্দিব তাহার চরণ মস্তকে করিব ধারণ জোড় হস্তে ভূমিতে পড়িয়ে॥
তার পুত্র ঠাকুর দাস দোগাছিয়া গ্রামে বাস বন্দিব তার চরণ দুখানি।
সদ্য ভেকাশ্রিত হয়ে নিজ দেহ তেয়াগিয়ে সদ্য সমাজ লয়েছেন তখনি॥
তার ভক্ত বিন্দু যে যে শুত্র বন্দিব তাহার পুত্র গোবর্দ্ধন চৈতন্য জিনি।
তার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীচরণ চাঁদ পাতিল প্রেমের ফাঁদ এসে এই হৃদাতে আপনি॥
অশেষ গুণেতে গণ্য সনামা পুরুষ ধন্য যা হইতে জগত মাতিল।
তার চরণে প্রণামামি ধুলাতে লুটায়ে আমি জারে দেখে গোঁসাই কুবিরচাঁদ ভুলিল॥
তার পুত্র তিলক রতন বন্দিব করিয়ে জতন বন্দিব শ্রীফটিক চন্দ্রপাল।
একসঙ্গে একাসনে বসে থাকতাম দুই জনে প্রকাশিতাম মনের খেয়াল॥
এবে রামভদ্রে মতিমান বন্দিব হয়ে সাবধান বদন কমলে চুম্ব দিয়ে।
বীরচাঁদ গুণ মনি প্রাণচাঁদ মন মনি বন্দিব বাৎসল্য করিয়ে॥
এপার ওপার বংশ যে হইবে অংশ জন্মিয়াছে জন্মাইবে যে জন।
কৃতাঞ্জলি হয়ে তারে বন্দিব শিরেতে ধরে পূর্ব্বাপর করিয়ে শরণ॥
বন্দনা কি করিতে পারি কি সাধ্য বল আমারি মনের বাসনা যা হয়।
মাপ করো অপরাধে গোঁসাই কুবির চাঁদের রাঙা পদে রামলালের মন যেন রয়॥"[৭]

মুলিরাম পালের হাত ধরেই সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মতাদর্শ বিস্তার লাভ করে। মুলিরাম পালের মধ্যমপুত্র শ্রীচরণ পাল এই সম্প্রদায়কে আরও সুসংগঠিত ও প্রসারিত করেন এবং তাঁদের সাধনার আসন দোগাছিয়া গ্রামের পূর্বদিকে জলঙ্গীর অপর পাড়ে বৃত্তিহুদা গ্রামে স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তীকালে বৃত্তিহুদা গ্রাম সাহেবধনীদের কেন্দ্রীয় সাধনপীঠ হিসেবে খ্যাত হয়। বর্তমানে পাল পরিবারের সিদ্ধান্ত অনুসারে সুশীল পালের পুত্র শ্রীঅমলেন্দু পাল এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীপদ্মপলাশ পাল যৌথভাবে সম্প্রদায়কর্তা রূপে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের কার্যনির্বাহ করে চলেছেন।

কবি রামলাল ঘোষ যে-সব তথ্য সংরক্ষণ করেছিলেন, সেখানে চরণ পাল এবং কুবির গোঁসাই সম্পর্কিত বহু তথ্যাদি পাওয়া গেছে। রামলাল ঘোষের খাতা থেকে জানা যায় ১১৪৭ বঙ্গাব্দে চরণ পালের জন্ম। তিনি জানান, সাহেবধনী সম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষ শ্রীচরণ পালের খ্যাতি গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর দ্বারা সৃষ্ট মন্ত্র এবং তাবিজ-কবচ-মাদুলির প্রয়োগ ছিল অব্যর্থ। তাতে করে অনেক কঠিন ব্যাধি থেকে শিষ্যরা নিরাময় লাভ করত। এ-বিষয়ে তাঁর শিষ্য কুবির গোঁসাই একটি পদে বলেছেন—

"ওরে বৃন্দাবন হতে বড় শ্রীপাট হুদাগ্রাম।
যথা দিবানিশি শুনি দীনবন্ধু নাম।
হেরি নীলাচলে যেমন নিলে, এখানে তার অধিক নিলে
হিন্দু যবন সবাই মিলে স্বচক্ষে দেখতে পেলাম॥
দ্যাখো গোঁসাই চাঁদের বাজার—
ভক্তবৃন্দ আসছে যাচ্ছে অবিশ্রাম।
আমার চরণ চাঁদের নামের জোরে দুঃখী তাপী পাপী তরে
হাঁপ-কাশি শূল গুরুম ব্যথা মহাব্যাধি হয় আরাম॥
আছে ভোলানাথ কৈলাশপুরে, জগন্নাথ শ্রীক্ষেত্তরে—
অযোধ্যা নগরে ছিলেন শ্রীরাম।
প্রহ্লাদচন্দ্র রুকুনপুরে, রামচন্দ বামনপুকুরে
গোঁসাই কুবির আছে দ্বারে পূর্ণ করে মনষ্কাম॥"[৮]

(কবিকৃত বানান)

শ্রীচরণ পালের আধ্যাত্মিক শক্তি ও তার উৎস সম্পর্কে ছড়িয়ে রয়েছে নানারকম কিংবদন্তি। বৃত্তিহুদার পাল বংশের অন্যতম বংশধর এবং কুবির গবেষক ড. শুভ্রা ঘোষ মহাশয়া বলেছেন যে, দোগাছিয়া গ্রামেই শ্রীচরণ পাল একদিন গো-চারণের সময় অর্ধচন্দ্রাকৃতি ধাতব দণ্ড কুড়িয়ে পান এবং সেই সময় থেকেই তাঁর দেহের ভিতর একটি ঐশ্বরিক চেতনার প্রকাশ ঘটে। পরবর্তীতে তিনি স্বপ্নাদেশ পান যে, জলঙ্গি নদীর অপর পাড়ে বৃত্তিহুদা গ্রামে উক্ত চন্দ্রাকৃতি দণ্ডটি স্থানান্তর করতে হবে। সেইমতো তিনি বৃত্তিহুদা গ্রামে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে সাধনপীঠ নির্মাণ করেন। তারপর থেকেই উক্ত দৈবদণ্ডটি সাহেবধনী সম্প্রদায়ের বিগ্রহ রূপে পূজিত হয়ে আসছে।[৯]

৩

বাংলার অন্যতম গৌণধর্ম সম্প্রদায় কর্তাভজাদের মতো সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও উৎসব-মেলার আয়োজন করতে দেখা যায়। তাঁদের একটি উৎসব হয়ে থাকে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে পালবাড়িতে। সেখানে উক্ত দিনে সম্প্রদায়ের সকল ভক্তের সমাগম ঘটে। সকাল থেকেই দীনদয়ালের উদ্দেশ্যে ভোগপূজা আয়োজিত হয়। শিষ্যেরা দীনদয়ালের আসনে মাটির সরায় চিঁড়ে-ফল-বাতাসা দিয়ে মালসাভোগ নিবেদন করেন। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু করে সারারাত ধরে চলে বাউল সংগীত। সে সংগীতগুলি মূলত কুবির গোঁসাই, যাদুবিন্দু গোঁসাই প্রমুখ পাল বাড়ির শিষ্যদের কর্তৃক রচিত। সকালে শিষ্যরা যে-যার গৃহে ফিরে যান। যাওয়ার আগে তাঁরা দীনদয়ালের ঘরের সামনে থেকে মাটি সংগ্রহ করেন।

আর একটি উৎসব বা মেলার সন্ধান পাওয়া যায়, যার সঙ্গে সাহেবধনী সম্প্রদায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেটি হলো অগ্রদ্বীপের মেলা। নদিয়া, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা, গঙ্গা তীরবর্তী এই অগ্রদ্বীপে চৈত্র-একাদশী তিথিতে মেলা বসে। জানা যায়, শ্রীচরণ পাল কর্তৃক অগ্রদ্বীপে সাহেবধনীরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং অগ্রদ্বীপ মেলার সূচনা হয়েছিল।

বৃত্তিহুদা গ্রামের পাল বাড়িতে আজও সংরক্ষিত আছে 'অগ্রদ্বীপের খাতা' (১৩২১), যা দেখে ধারণা সুস্পষ্ট হয় অগ্রদ্বীপের মেলার সাথে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেখানে দেখা যায় প্রায় ১০০ বছর আগেকার সমবেত নাম-ঠিকানা সম্বলিত বিভিন্ন ফকিরদের তালিকা, যারা সকলেই সাহেবধনী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অগ্রদ্বীপের মেলায় তারা খাজনাও দিয়েছেন। তালিকাটি অনেকটা এইরকম:

> কালীচরণ, রাধানাথ, ক্ষেত্রনাথ, কেদার, তেঁতুল, বাণী, দীন ও অনুকূল ঘোষ (বৃত্তিহুদা), কেদারনাথ পাল (বীরপাড়া), কোকিল সেখ (পাঁচমেলা), হারানি বিবি (বৃত্তিহুদা), মোকাম হালসানা (ঘূর্ণী), গহর সেখ (আড়ংসরিষা), প্রতাপ পাড়ুই (ডোমপুকুর), কেদার শাহ (দরিয়াপুর), নবীন দাস (শান্তিপুর), রজনী ঘোষানী ও কান্তি মিস্ত্রি (বাঙালঝি), রব্বানী দফাদার (গোখুরাপোতা), ছকু মল্লিক (বারুইপাড়া), ফটিক পাল (পাঁচ ভাঁড়া), খাতের হালসানা (মুণ্ডমালাপাড়া), যাদু ঘোষ (চকবিহারী), খোজি শাহ, দেরাজ খান (চারাতলা), মিঞাজান মোল্লা (নওদাপাড়া), কোপান শাহ (চাঁদঘর), আবু বিশ্বাস (বড় শিমলি), কালাচাঁদ মোল্লা, মেহের শাহ, চন্দ্র হালসানা (ধন্তেপুর), বিবি ফাকি, ফুল শাহ্ (তালুকহুদা), কালি শাহ্, গোকুল ঘোষ, ফণী শাহ্ (ধোপট), রায়বাড়ি মণ্ডল, নুটু হালসানা, ভক্ত খাদিম (পলশুণ্ডা), পঞ্চু শাহ (সোনাতলা), নটবর দাস, নজরদ্দি সেখ, হাজারী, মহেন্দ্র পাড়ুই (পীতাম্বরপুর), হাচেলাদি ফকির, রসিক দাস (লোহাগাছি), বেনীমাধব মণ্ডল (বয়ার বাঁধা), জানকী গড়াই (হাঁসপুকুর), এতবার শাহ্ (বেনাদহ), বাণীকান্ত স্বর্ণকার (চড়ুইটিবি), অবিলাস পাড়ুই (ঘোষপুর), গয়াচরণ দাস (শিবনগর), ব্রজ ঘোষ (বেলপুকুর), বেহারী খাদিম (ডিঙ্গেল), মহামায়া বিবি (হরনগর), মনোহর দাস (কাগরহুদা), ইংচাঁদ ফকির (চাঁদপুর), বাঘা দাসী, সুস্বর মল্লিক (কেশেডাঙা), বেহারী শাহ (শলি), গোপাল শাহ, ফকির দাস (বাগুন্দে), দরবারী রাজবংশী (সদাগরপুর), গোলাম শাহ (বানগড়িয়া), মেঞাজান খাদেম (যমপুকুর), ভুবন শাহ (তেহট্ট), রংনাল শাহ (কুলগাছি), হেদাত শাহ, রাখাল মাল (ঘোড়াইক্ষেত্র), কায়েম শাহ (হাজরাপোতা), পবন শাহ, (নলদহ), হরি শাহ, তোপেন শাহ (বিক্রমপুর), উত্তম শাহ (গাবকুলা), সেকান্দর মণ্ডল (কোমথানা), রামগোপাল দাস (বামুনপুকুর), ব্রজদাসী (কাপাসডাঙা), লক্ষণ পাড়ুই (নাটনা), পাগল দাস (বহরমপুর), বারি শাহ (দেয়ম), এবায়েত হালসানা (ধাপাড়িয়া), খুশি দাওয়ান (শালিগ্রাম), বাহির শাহ (দিকবরেয়া), ফড়িং শাহ (বহিরগাছি), গগন মণ্ডল (রুদ্রনগর), গোকুল হালদার (মেচপোতা), মিস্টু মল্লিক (রাধানগর), সূর্যকান্ত (কমলবাটি)।[১০]

উপরিউক্ত তালিকা লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, উক্ত শিষ্যগণের কেউই উচ্চবর্ণের নয়; এমনকি স্ত্রীলোকদের মধ্যেও সাহেবধনীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে দেখা যায়। একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, আজ পর্যন্ত সাহেবধনী সম্প্রদায়ে কোনো ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ জাতীয় উচ্চবর্ণের মানুষ যোগ দেননি। কর্তাভজাদের সম্প্রদায়ে উচ্চবর্ণের মানুষদেরও যোগ দিতে দেখা যায়। জানা যায় কেরি, মার্শম্যান প্রমুখ মানুষও ঘোষপাড়ায় যেতেন। রামমোহন রায় উৎসাহিত ছিলেন কর্তাভজাদের ধর্মতত্ত্বে। নবীনচন্দ্র সেনও তাঁদের সম্বন্ধে উন্নত ধারণা পোষণ করতেন।[১১] কিন্তু সাহেবধনীদের ক্ষেত্রে আমরা সচরাচর উচ্চবর্ণের মানুষদের আগ্রহ লক্ষ করি না। তবে অবশ্য ব্রাহ্মণ ভোজনের বিষয়টি সাহেবধনী সম্প্রদায়েরর আচারে রয়েছে। চৈত্রমাসের একাদশীতে অগ্রদ্বীপের মেলা এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় বৃত্তিহুদার মহোৎসবের মধ্যে যে-কোনো একদিন পাল বাড়ীতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়। এই ব্রাহ্মণদের বসাতে হয় নতুন মাদুরে। ব্রাহ্মণ ব্যবহৃত মাদুরগুলি 'আসুনে ফকির'দের মধ্যে বন্টন করা হয়। এই বিষয়টি কেন এবং কীভাবে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত হলো, সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। তবে আদর্শগত দিক থেকে এটি অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। যদিও এ বৈশিষ্ট্যটি আর কোনো গৌণধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না।

অগ্রদ্বীপের মেলা সাহেবধনীদের ধর্মাচরণের একটি অংশমাত্র। বিভিন্ন নথি ঘেঁটে ও কুবির গোঁসাইয়ের গানগুলি বিশ্লেষণ করে এটুকু বোঝা যায় যে, সাহেবধনীদের ধর্মচারের সবকিছুর প্রবর্তক শ্রীচরণ পাল নন। পারিপার্শ্বিক হিন্দু ধর্ম ও

অন্যান্য গৌণধর্মের প্রভাব এই সমস্ত বিশ্বাস ও আচারগুলিকে দানা বাঁধতে সাহায্য করেছে। এঁরা মনে করেন, দেহ ঈশ্বর বা গুরুর অধিকারে থাকে। তাই দেহটিতে বাস করতে হলে খাজনা দিতে হবে। তাঁরা বিশ্বাস করেন পালবংশের সাত পুরুষের দেহে দীনদয়াল বাস করবেন। শ্রীচরণ পাল প্রথম সেই অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁরা মনে করেন ঠাকুরবাড়ি কিংবা অগ্রদ্বীপের যে জায়গায় ত্রিশূল পোঁতা থাকে সেখানকার মাটি খেলে ও গায়ে মাখলে সব রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তাঁরা বিশ্বাস করেন আকাশ, মাটি, আগুন ও জল—এই চার শক্তিই মানবাত্মার উৎস; একটিকেও বাদ দিয়ে ঈশ্বরের উপলব্ধি কখনও সম্ভব নয়। তাই তাঁরা প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব করার চেষ্টা করেন।

সাহেবধনীরা গোরুকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন। গো-পালন ছিল পালদের প্রধান জীবিকা। যেহেতু এই সম্প্রদায়ীরা শ্রীচরণ পালকে ভক্তি করে, সম্ভবত তাই তাঁর জীবিকাও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হলো। তাঁরা ঈশ্বর সেবার আগে গোরুকে সেবা করেন। তাঁরা মনে করেন মৃত্যুর পর দেহ মাটিতে মিশে যায় এবং সেখান থেকে ঘাস জাতীয় গোখাদ্য তৈরি হয়ে তা পুনরায় ঈশ্বরের সেবায় কাজে লাগে। একমাত্র কৃষ্ণই গো-সেবা করেছেন বলে এই সম্প্রদায়ীরা দীনদয়াল বলতে কৃষ্ণকে মানে বলে মনে করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক রাজিব আহমেদ। তিনি মনে করেন, ভক্তরা দীনদয়ালের কাছে যে সন্তান মানত করে তা কৃষ্ণেরই গোপাল মূর্তি।[১২]

সম্প্রদায়ীদের মধ্যে অনেকে আবার বিশ্বাস করেন যে, এই দীনদয়াল আসলে শিবশক্তি। বৃত্তিহুদায় সাহেবধনীদের সাধনপীঠে যে ত্রিশূলাকৃতি লৌহদণ্ড আছে, সেটিকে অনেকে শিবের ত্রিশূল বলে মনে করেন। তাঁদের যুক্তি হলো, শিব যেহেতু আদিনাথ এবং তাঁদের দীনদয়াল যেহেতু সমস্ত শক্তির উৎস, তাই দীনদয়াল হলেন শিবশক্তি। আর প্রকৃতি না থাকলে পুরুষ থাকে না; অর্থাৎ মা না থাকলে বাবা থাকে না—প্রকৃতি ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই তাঁরা ত্রিশূলের গায়ে সিঁদুর মাখিয়ে সৃষ্টি প্রকাশ করেন।

গৌণধর্ম সম্প্রদায়গুলির অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, এঁরা প্রকৃতি জগতের বিভিন্ন বস্তুকে প্রতীক করে তার উপাসনা করে থাকেন। প্রতীকের মধ্যেই তাঁদের ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি নিহিত থাকে। সাহেবধনী সম্প্রদায়েও দেখা যায় এই প্রতীকীতত্ত্ব। তাঁদের ধর্মীয় প্রতীক চিহ্ন হলো ত্রিশূল, ফকিরদণ্ড, খড়ম এবং সুসজ্জিত বিছানা। সেগুলির উপাসনা করা, ভোগ দেওয়া ইত্যাদি নানান আচারবিধি তাঁরা পালন করেন। এঁদের উপাসনার স্থানের নাম 'আসন'। সে আসন একখানি চৌকি বিশেষ। প্রতি বৃহস্পতিবার ওই আসনে সকলে সমবেত হয়ে ভোগ নিবেদন, গীতার্চনা ও তাঁদের 'গোপ্ত' সাধনা করেন। এঁদের উপাস্য দেবতার নাম দীনদয়াল, নামান্তরে দীনবন্ধু। সাহেবধনীদের পুঁথিপত্রের শিরোদেশে লেখা থাকে 'শ্রীশ্রী দীনদয়াল প্রভুর পাদপদ্ম ভরসা'। সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা স্বগৃহে আসন নির্মাণ করার অধিকারী, তাঁদের নাম 'আসুনে ফকির'। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র আসুনে ফকিরেরাই দীক্ষাদানের অধিকারী। এঁরাই একমাত্র সাহেবধনী সম্প্রদায়ের কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তবে এঁরা প্রধানত গৃহী এবং বৈষ্ণবদের মতো এঁরা ভেক ধারণও করেন না, বা বাউল ফকিরদের মতো আলখেল্লাও পরেন না।[১৩]

পূর্বেই বলেছি যে সাহেবধনীরা মূলত বৈষ্ণব-সহজিয়া মার্গ প্রভাবিত। কুবির গোঁসাইয়ের বিভিন্ন গানে বার বার এসেছে রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ, এসেছে গোরাচাঁদের কথা, এসেছে বৃন্দাবনও। কুবির গৌরতত্ত্বের সাথে সাহেবধনী সাধনের চন্দ্রতত্ত্বকে মিশিয়ে দিয়েছেন এবং এই অনুষঙ্গেই সাহেবধনীদের কাছে গুরুমান্য পেয়ে থাকেন গোরাচাঁদ ওরফে শ্রীচৈতন্যদেব। কুবির তাঁর গানের খাতার ৪০৭ সংখ্যক গানে বলেছেন,

"ভুলব মনেতে করি চাঁদ গৌরময় সকলি হেরি
হেরি সব চাঁদের উজ্জলা।
হেরি গৌরচন্দ্রের নখ চন্দ্রে কোটিচন্দ্র করে খেলা॥"

(কবিকৃত বানান)

নূরউদ্দিন মহাশয় বলেছেন, "সাহেবধনীদের চন্দ্রতত্ত্ব আসলে কিন্তু মিথুন তত্ত্ব। এই চন্দ্রতত্ত্বেই এসেছে নবতত্ত্বের কথা। কখনো চব্বিশ চন্দ্র আবার কখনো চার চাঁদের কথা বলা হয়েছে। চব্বিশ চন্দ্র হলো পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তাদের পাঁচ রকম কাজ। পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় এবং তাদের পাঁচ প্রকার কাজ তৎসহ চার অন্তরেন্দ্রিয়। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় হলো চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক এবং এদের কাজ। কর্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ, বাক পায়ু ও লিঙ্গ এবং এদের কাজ। অন্তরেন্দ্রিয় হলো মন, বুদ্ধি, চিন্তা এবং অহংকার। দেহ সাধনার মাধ্যমে সহজিয়া সাধককে আয়ত্ত করতে হয় ঐগুলির নিয়ন্ত্রণ শক্তি। অসিদ্ধ দেহ কাঁচা হাঁড়ির সাথে তুলনীয়। জলে দিলেই তা গলে যায়। অপরদিকে সাধকের দেহ সিদ্ধদেহ কেবলমাত্র সিদ্ধদেহের অধিকারীদিগের পক্ষেই সাধনসিদ্ধ হওয়া সম্ভব।"[১৪]

বৈষ্ণব-সহজিয়া মার্গ প্রভাবিত হলেও এক দেহে রাধা-কৃষ্ণ রূপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব তত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন লোকায়ত ভাবনার বাউল ও সাহেবধনীরা।[১৫] সে কারণেই নিজেদের সাধনতত্ত্বের অনুকূল এবং সহায়ক হিসেবেই তাঁদের পদে এসেছে গোরাচাঁদ। কুবির গোঁসাই বলেছেন,

"গৌর কি জাত বটে, খেয়া দিচ্ছে ভব নদির ঘাটে।
হয়েছে কাণ্ডারি ভাঙ্গা নায়ে, বসে হাল ধরেছেন কসে এঁটে॥"[১৬]

—কুবিরের মতে গোরাচাঁদের কোনো জাত ছিল না, যেমন সাহেবধনীর কোনো জাত নেই। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ধর্মবোধের উজান পথে গৌরাঙ্গপন্থী এবং সাহেবধনীরা যেন সহযাত্রী।

৪

অন্যান্য গৌণধর্ম সম্প্রদায়ের মতো সাহেবধনীদের প্রচার ও প্রসারের মূল আধার হলো তাঁদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বলিত গান। কুবির গোঁসাই ছিলেন সাহেবধনীদের প্রধান গান রচয়িতা ও গায়ক। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনকালে প্রায় সাড়ে বারোশো গান রচনা করেছেন। এই গানের মাধ্যমেই সম্প্রদায় প্রসারিত হয়—প্রচারিত হয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব তত্ত্ব ও দর্শন। মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়ে দূরদূরান্তে। এই গান উপলক্ষে মানুষ সমবেত হয়; ঐক্য গড়ে ওঠে। সাহেবধনীদের সাধনপীঠে প্রতি বৃহস্পতিবার গানের আসর বসে। এছাড়া তাঁরা প্রতিবছর অগ্রদ্বীপের মেলায় দুই রাত ধরে গানের অনুষ্ঠান করে থাকেন। কর্তাভজারাও প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যার পর সমবেত হয়ে ভাবের গান করেন। তাছাড়া প্রতিবছর দোল পূর্ণিমার সময় কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় বিরাট মেলা বসে এবং সেখানে বহু হিন্দু বাউল ও মুসলমান ফকির সমবেত হন। বৃহত্তর বাউল সমাবেশের দিক থেকে বীরভূমের কেঁদুলি মেলা এবং কল্যাণীর ঘোষপাড়ার মেলা বিখ্যাত। এই মেলার মূল আকর্ষণ হলো বাউল সংগীত।

যেহেতু লোকধর্ম সম্প্রদায়গুলি সনাতন ধর্মের বিরোধী, তাই তাঁরা যেসব মন্ত্র ব্যবহার করেন, তা সংস্কৃত ভাষার রচিত হয় না। তাঁদের হৃদয়ের আকুতি মিশ্রিত আবেদনই মন্ত্র রূপে উচ্চারিত হয় এবং এ-মন্ত্রের ভাষা সহজ-সরল বাংলা। কর্তাভজা সম্প্রদায়ে সতীমার উদ্দেশ্যে যে মন্ত্র পাঠ করা হয় কিংবা এঁদের যে বীজমন্ত্র, তা সবই বাংলা ভাষায় রচিত। কর্তাভজাদের একটি মন্ত্র হলো—

"কর্তা আউলে মহাপ্রভু, তোমার সুখে চলি বলি,
যা বলাও তাই বলি, যা খাওয়াও তাই খাই,
তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ নই।"[১৭]

সাহেবধনী সম্প্রদায়ের যেসব মন্ত্র আছে, তার ভাষা বিচার করলে দেখা যাবে সেখানে বাংলা ছাড়া দু'-একটি আরবি শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। কিছু-কিছু দুর্বোধ্য শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। এঁদের মন্ত্রের সঙ্গে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মন্ত্রের ভাবগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রগুলি হলো:

১. "ক্লিং সাহেবধনী আল্লাধনী
দীনদয়াল নাম সত্য।
চারিযুগ সত্য। কাম সত্য। করণ সত্য।
ঠাকুর সত্য। দীনদয়াল সত্য।
... দীননাথ সত্য। ... দীনবন্ধু সত্য।
গোঁসাই দরদী সাঁই
তোমা বই আর আমার কেহ নাই॥"

২. "গুরু তুমি সত্যধন
সত্য তুমি নিরঞ্জন।
খাকি তোমার নাম সত্য।
কাম সত্য। সেবা সত্য। ঠাকুর সত্য।
বাক সত্য। গুরু সত্য।"[১৮]

সাধারণত সনাতন ধর্মের আচার-বিচার, তত্ত্বকথা লিখিত থাকে তাঁদের শাস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থে। গৌণধর্মের ক্ষেত্রে তেমন কোনো লিখিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কোনো কোনো সম্প্রদায়ে কিছু হাতেলেখা পুঁথি পাওয়া গেলেও সেগুলি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মর্যাদা পায়নি। সাহেবধনী সম্প্রদায়েরও কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তাঁদের ধর্ম সংক্রান্ত আচারবিধি সবই মুখে মুখে প্রচলিত। এর প্রধান কারণ হিসেবে বলা যায়, গৌণধর্ম সম্প্রদায়ের সাধকেরা অধিকাংশই নিরক্ষর। তাছাড়া বিষয়টি এমনও ছিল না যে কেউ গুরুর কথা লিখে রাখবেন। কেননা তাঁদের সাধ্য-সাধন পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। তাই লেখার দিকে না গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে প্রহেলিকাময় ভাষায় গান রচনা করে তার মধ্যে সাধনপদ্ধতির নিয়মবিধিকে চির অক্ষয় রাখার প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁদের সংগীতগুলি সাধনার গোপন প্রণালীকে ব্যক্ত করেছে। কিন্তু আজও তা অধিকাংশ অব্যক্ত রয়ে গেছে। কেননা সেসব সংগীতের মর্মার্থ উদ্ধার করা একটি দুঃসাধ্য কাজ। পাশাপাশি সেইসব গানের সুরের মধ্যে রয়েছে আকুল করা প্রাণের স্পর্শ, আধ্যাত্মিক অনুভূতি। আর তার ফলেই যুগ-যুগান্তর ধরে গানগুলি লোকমুখে প্রচারিত থেকে সম্প্রদায়ের তত্ত্ব ও দর্শনকে চির অক্ষয় করে তুলেছে।

সাহেবধনীদের সাধনতত্ত্বের অন্যতম বিষয় হলো দেহতত্ত্ব। এই দেহসাধনা বৌদ্ধ-তন্ত্র-যোগাচার থেকে ক্রমবিকশিত হয়ে গৌণধর্ম সম্প্রদায়গুলিকে আচ্ছন্ন করেছে। এই সকল লৌকিক সম্প্রদায়গুলি সমাজের অতি সাধারণ, নিরক্ষর জনজাতি কর্তৃক গড়ে উঠলেও তাদের ধর্মীয় সাধনপদ্ধতিতে কিছু গুহ্য, দুরূহ সাধনার প্রচলন দেখা যায়। এইরকম গুহ্যসাধনা বিশেষত দেহসাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য প্রয়োজন সদ্‌গুরুর নির্দেশ, সৎসঙ্গ। এছাড়া এখানে নারীর সঙ্গে সংযুক্তভাবে সাধনা করার রীতি রয়েছে, যাকে মিথুনাত্মক সাধনা বলা হয়। এই মিথুনাত্মক সাধনার দ্বারা সাধক ছয় রিপুকে ধ্বংস করে যে ভাবলোকে উন্নীত হয়, সেখানে থাকে কামনা-বাসনাহীন প্রশান্তি ও আনন্দের স্তর। এই অবস্থা প্রাপ্তিকে বলা হয় 'জ্যান্তে মরা'।

সাহেবধনী সম্প্রদায় সাধনসঙ্গিনীর সাহায্যে মিথুনাত্মক সাধনার দ্বারা কামকে জয় করে মোক্ষলাভ করতে চান। কিন্তু কর্তাভজারা নারীবর্জিত সাধনা করে কামকে জয় করতে চান। তাই সেখানে মিথুনাত্মক সাধনার স্থান নেই। এঁরা দেহের মধ্যেই নারী-পুরুষের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। তাঁরা মনে করেন একই দেহে নারী-পুরুষ উভয়ই বিদ্যমান এবং তাঁরা চিরসঙ্গী ও অভেদ। এদের মিলনই ভক্ত আর ভগবানের মিলন। সেজন্য তাঁদের সমাজে একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে— "মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্তাভজা।" সম্প্রদায়ী লোকেরা পরস্পরকে ভ্রাতৃ-ভগিনী সম্বোধন করে থাকেন।

বলরামী সম্প্রদায় গৃহী জীবনযাপন করলেও মিথুনক্রিয়া থেকে নিজেদের দূরে রাখেন। তাঁদের জগতে পুরুষ বলে আলাদা কোনো জাতি নেই। নারী-পুরুষ সকলেই নারী; একমাত্র হাড়িরামই পুরুষ। তাই সম্ভোগের বাসনা তাঁরা করেন না। কেবলমাত্র জন্মের প্রয়োজনেই স্ত্রীকে তাঁরা নারীরূপে দেখেন।[১৯]

বাউল সম্প্রদায়ে মিথুনাত্মক সাধনা আরও বেশি প্রকট। বাউল সাধকেরা সাধনসঙ্গিনী ছাড়া সাধনায় অগ্রসর হতে পারেন না। যে-কোনো লৌকিক ধর্মের মতো বাউল সম্প্রদায়েও অযথা বীর্যক্ষয় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কামশক্তিকে বশীভূত করে সাধনায় অগ্রসর হওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। তাঁরা সাধনসঙ্গিনীর দ্বারা কামশক্তিকে বশীভূত করে দেহমিলনের মধ্যে দিয়ে সাধনার চরম লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতে চান। তাই সেখানে বীর্যপাতন যাতে না ঘটে সেদিকে সাধককে সতর্ক থাকতে হয়। এর জন্য সাধকেরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগসাধনার সাহায্য নেন। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সাধক কুম্ভক ক্রিয়ার শক্তি লাভ করেন। কুম্ভক শক্তির দ্বারা সমস্ত নাড়ী পরিশুদ্ধ হয়ে বায়ু সুষুম্নাপথে চালিত হলে বিন্দুর স্থৈর্যলাভ ঘটে। এই স্থির বিন্দুকে ঊর্ধ্বপথে চালিত করাই বাউলদের দেহসাধনার মূল লক্ষ্য।[২০] তাঁদের বিশ্বাস ঈশ্বরের আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। দেহের মধ্যেই তাঁর অবস্থান। তাই সেই মহাশক্তি 'অচিন পাখি'র রহস্যভেদ করার জন্য তাঁরা দেহসাধনা করে থাকেন।

এই দেহসাধনা একেক সম্প্রদায়ে একেকরকম হলেও মূল লক্ষ্য প্রায় একই এবং এই দেহ সাধনার মধ্যে দিয়েই সম্প্রদায়গুলোর দার্শনিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহেবধনী ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের যোগসাধনার মধ্যে যে দার্শনিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তা হলো, মনকে শান্ত ও সংযত করে মনকে একনিষ্ঠ করে তোলা, যার দ্বারা ভক্ত ঈশ্বরের চিন্তায় মনকে নিয়োজিত করতে পারে। এক্ষেত্রে বাউল সম্প্রদায়ের দার্শনিক চেতনা কিছুটা স্বতন্ত্র। এখানে তাঁরা নাড়িকে পরিচালনা করতে চান এবং এভাবেই তাঁরা একদিকে রিপুকে জয় করতে, অপরদিকে জরা-ব্যাধি রোধ করার ক্ষমতা অর্জন করতে চান।[২১]

তাই আচার-আচরণ, ধর্মীয় দর্শন, সাধনপদ্ধতি ইত্যাদি নানা বিষয় বিচার করলে বাউল, সাহেবধনী, বলাহাড়ি, কর্তাভজা প্রভৃতি গৌণধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু-কিছু বৈসাদৃশ্য উঠে আসে। তবে আদর্শগত দিক থেকে তাঁরা অনেকটা কাছাকাছি। তাঁদের সামাজিক লক্ষ্য একটাই এবং তা হলো অবক্ষয়িত সমাজের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করা। সেজন্য প্রতিটি সম্প্রদায়েই শিষ্যদের চারিত্রিক পরিশুদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

সূত্রনির্দেশ:

১. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, (২০১৪), *বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড,* জেনারেল প্রিন্টার্স য্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., পৃ. ১৬৭।
২. মুরশিদ, গোলাম, (২০০৬), *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি,* অবসর প্রকাশনা সংস্থা, পৃ. ৫৭।
৩. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, (১৪২৬ ব.), *বাংলার বাউল ও বাউল গান,* ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃ. ২৯০।
৪. গোস্বামী, ড. ননীগোপাল, (১৩৭১ ব.), *চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব,* করুণা প্রকাশনী, পৃ. ১৮৬।
৫. সাক্ষাৎকার: ফজলুর রহমান বিশ্বাস, কালীনগর, নদিয়া-৭৪১১৪০, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ, ০২.০৮.২০২৩।
৬. চক্রবর্তী, সুধীর, (২০০৩), *বাংলার গৌণধর্ম: সাহেবধনী ও বলাহাড়ি,* পুস্তক বিপণি, পৃ. ২৩-২৪।
৭. বিশ্বাস, নূরউদ্দিন, (২০০৮), *সাহেবধনী: কবি কুবির গোঁসাই ও কবি রামলাল ঘোষ—সমাজ সাহিত্য ও সংগীত,* পৃ. ১৩৫-১৩৬।
৮. সূত্রধর, নগেন্দ্রনাথ, (২০১০), (সম্পা.), *ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে: কুবির গোঁসাই-এর সুনির্বাচিত একশত সংগীতের অঞ্জলি,* (প্রথম খণ্ড), কসমস প্রিন্টার্স, পৃ. ৮৫।
৯. ঘোষ, ড. শুভ্রা, (২০১৩), *কুবিরের জীবন জিজ্ঞাসা ও শিল্পরীতি,* এম.সি সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., পৃ. ৫২।
১০. চক্রবর্তী, সুধীর, (২০০৩), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৬।
১১. *তদেব,* পৃ. ৩৫।
১২. আহমেদ, রাজিব, (২০১১), *কুবির গোঁসাই ও সাহেবধনী সম্প্রদায়,* আনন্দধারা, পৃ. ৪৯।

১৩. হোসেন, ড. মোহা. জাহাঙ্গীর, (২০১৫), *অবিভক্ত নদীয়া জেলা ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি (১৭৮৬-১৯৪৭ খ্রি.)*, গতিধারা, পৃ. ১২৪।

১৪. বিশ্বাস, নূরউদ্দিন, (২০০৮), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০০।

১৫. *তদেব*, পৃ. ১০২।

১৬. কর্মকার, অসীমকুমার, (২০২১), (সম্পা.), *ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে: কুবির গোঁসাই-এর সুনির্বাচিত দেড়শত সংগীতের অঞ্জলি*, (দ্বিতীয় খণ্ড), আকাশ প্রকাশনী, পৃ. ৪৮।

১৭. আহমেদ, রাজিব, (২০১১), *কুবির গোঁসাই ও সাহেবধনী সম্প্রদায়*, আনন্দধারা, পৃ. ১২৭।

১৮. হোসেন, ড. মোহা. জাহাঙ্গীর, (২০১৫), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৪।

১৯. আহমেদ, রাজিব, (২০১১), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩২।

২০. *তদেব*, পৃ. ১৩৩।

২১. *তদেব*, পৃ. ১৩৬।